সাখাওয়াত হোসেন

সুবর্ণ-রাধিকা

৭৩

সুবর্ণ-রাধিকা

© সাখাওয়াত হোসেন

প্রথম মুদ্রণ: নভেম্বর, ২০২৩

প্রচ্ছদ: পরাগ ওয়াহিদ

বানান সংশোধন:
শারমিন জেসি ও তাহমিদ রহমান

সতীর্থ প্রকাশনা'র পক্ষে ১০/ক, জেলা পরিষদ মার্কেট (নানকিং দরবার হলের সামনে), মনিবাজার, রাজশাহী ৬০০০; যোগাযোগ: ০১৭৩৭৭২৪১৭০ থেকে **মো. তাহমিদুর রহমান** কর্তৃক প্রকাশিত এবং রংধনু অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, সুলতানাবাদ, নিউ মার্কেট, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত; যোগাযোগ: ০১৭৩০-৯১৯৭৭৭

বাংলাবাজার শাখা:
দোকান নং – ১১৭,
গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স
৩৭, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

মূল্য: তিনশত আশি টাকা মাত্র
Price: 380TK | INR: 300 ₹ | USD: $14

Subarna-Radhika by **Shakhawat Hossen**
Published by **Md. Tahmidur Rahman**, **Satirtho Prokashona**,
10/ka, Zila Porishod Market, Monibazar, Rajshahi
Published: Nov. 2023
ISBN: 978-984-97205-8-4

বন্ধুত্ব হোক বইয়ের সাথে...

উৎসর্গ

আহির ও আনহা'কে।

একজন ধমক খাওয়ার ভয়ে আমার রুমের দরজায় উঁকি দেয় না।
আরেকজনের প্রধান কাজ কিছুক্ষণ পর পর দরজায় ধাক্কা দিয়ে কড়া স্বরে জিজ্ঞেস করা–সারাদিন বসে বসে কী কচুর মাথা লিখিস?

ভূমিকা

প্রতিটা বইয়ের শুরুর ক'টি পৃষ্ঠা আলাদা করে বরাদ্দ থাকে। ওখানে লেখক বইয়ের পেছনের গল্প বলেন। যদি তা গল্প হয়, তবে বলা যায় গল্পের পেছনের গল্প। 'ভূমিকা' লিখতে বসে আমি উপলব্ধি করছি, ভূমিকার চেয়ে দু'টো গল্প লিখে ফেলা সহজ কাজ। আমার কোনো গল্পের পেছনের গল্প নেই। এই গল্পগুলো কেন লিখেছি আমি জানি না। কীভাবে, কোথায়, কখন লেখা হয়েছে সে সম্পর্কেও কোনো ধারণা নেই। উদ্দেশ্য নেই, বাংলা সাহিত্য জগৎ-এ স্থান পাওয়ার কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই, সাহিত্য পদক/পুরস্কার পাওয়ার প্রত্যাশা নেই। অত 'নেই নেই'-এর ভিড়ে কোথাও আমার আছে কিছু অকৃত্রিম শুভাকাঙ্খী। যারা মনে করেছেন, এই গল্পগুলো বইয়ের পাতায় উঠে আসা দরকার। এবং তাদের চিন্তা-ভাবনার উপর আমার খুব একটা ভরসাও নেই।

তিন বৎসরে আমি প্রায় দু'শো পঞ্চাশটা গল্প লিখেছি। দিন হিসেব করলে প্রতি চার দিন অন্তর একটা করে গল্প। যখন গল্পগুলো বইয়ে আনার জন্য খুঁজলাম, এই ক'টি গল্পই পেলাম উপযুক্ত। তিন বৎসরে আমি অজস্র আবর্জনা লিখেছি। কেন লিখেছি জানি না। অথবা, জানি। প্রতিটা গল্পের শেষ লাইন লেখার পর আমি আমার ক্ষুদ্র জীবনের সর্বোচ্চ তৃপ্তিটা পেয়েছি। যা কোনো অমৃত খাদ্য গ্রহণে পাইনি। না কোনো চমৎকার সঙ্গে, না কামে, না প্রেমে। খুব সম্ভবত শরাবান তহুরা পানেও পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। অন্দ হোক, মন্দ হোক; প্রতিটা গল্পের শেষ লাইন পরবর্তী তৃপ্তি, আনন্দ, যেটুকুন ছটাক উচ্ছ্বাস–আমি ওই মুহূর্তের নিকট বন্দী।

বই সংশ্লিষ্ট প্রতিটা মানুষের নিকট কৃতজ্ঞতা।

– লেখক

সূচিপত্র

আদিম	০৭
প্রসূন	২০
গ্রন্থন	৩১
বৃশ্চিক	৩৭
অপার্থিব	৪৮
অন্তরকলন	৫৭
বিভাস	৬৬
শালুক	৭৩
পারাবার	৮৫
অংশন	৯১
মোচক	১০২
মন্দির	১১০
ঘুম	১১৯
হাওয়া	১২৭
লা পেরেগ্রিনা	১৩৯
অন্বয়	১৫০
নবমী	১৬০
দাহ	১৭০
জননী	১৭৭
অর্বুদ	১৮৯
সুবর্ণ-রাধিকা	১৯৮

আদিম

আমি ভয় পাই। যা ভয় পাই, তা বর্ণনা করতে পারি না। ওটার কোনো আকার নেই। ছোঁয়া যায় না। এবং খুব সম্ভবত দেখাও যায় না তা। তবে ভয়টা পাই কী করে? শুরুর গল্পটা বলি। ছোটবেলা। তখন ওয়াশরুম ভয় পাই খুব। এই ভয়টা বর্ণনা করা যায়। ছাই রঙা দেয়াল, একটা কাঠের দরজা, বাইরে সুইচবোর্ড, ভেতরে হলুদ বাল্ব, একটা কমোড, পানির ট্যাপ ও বদনা। ভয়টার আকার আছে। আয়তাকার দরজা, বর্গাকার ছাদ, বৃত্তাকার বাল্ব। দেখাও যায় এই ভয় স্পষ্ট। একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত আমি ওয়াশরুমের দরজায় খিল আটকে হাগতে বসিনি।

এক সন্ধ্যায় মায়ের সাথে ঝগড়া করলাম খুব। মা খুব রাগী। তিনি আমার ওয়াশরুমভীতি সম্পর্কে ভালো করে অবগত। ঝগড়ার এক পর্যায়ে বিরক্ত মা কী করলেন? আমায় টেনেহিঁচড়ে এনে ওয়াশরুমে ঢুকালেন। বাইরে থেকে সুইচ অফ করলেন। ধুপ করে হলুদ বাল্বটা নিভে গেল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ছেয়ে গেল ভেতর। ডান দেয়ালের উপরে ছোট্ট একটা ঘুলঘুলি ছিল। ওটার ফাঁকফোঁকর দিয়ে সন্ধ্যার আবছা আলো ঢোকার চেষ্টা করল। কিছু ঢুকল, কিছু আটকে রইল ফুঁটোয়। আমার শরীর জমাট বেঁধে গেল। একেকটা হাত পায়ের ওজন হলো এক মণ। নাড়াতে পারলাম না। লাথি মেরে দরজা ভাঙতে চাইলাম, পা আটকে রইল কোথাও। চিৎকার করতে চাইলাম, স্বরও আটকে রইল কোথাও।

মা যদিও প্রচণ্ড রাগের বশে অমন অমানবিক কাজ করেছিলেন। তবুও একটু হুঁশ ছিল তার। দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। এবং চিৎকার করে আমায় বকাঝকা দিচ্ছিলেন যাতে আমি ভয় পেলেও বুঝতে পারি, দরজার ওপাশে তিনি আছেন। মায়ের কৌশল কাজে লাগল না।

আমি ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম অন্ধকারে। আর অনুভব করলাম, মায়ের বকাঝকা দূরে সরে যাচ্ছে ক্রমশ। ওয়াশরুম কাঁপছে থরথর করে। আমি দেয়ালে হাত রেখে সামলালাম নিজেকে। মায়ের বকাঝকা থেকে ওয়াশরুমের দূরত্ব তখন আনুমানিক দশ-বারো হাত; আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, কেউ ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ওয়াশরুমটা কোথাও। আতঙ্কে আমার পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো। শীতল শিরশির টের পেলাম পায়ের তালুতে। পরমুহূর্তে বুঝলাম, শিরশির আতঙ্কে নয়। কমোড থেকে গলগল করে পানি উঠছে। ঠাণ্ডা পানি। পানির সাথে আরও কিছু উঠছে। খুব সম্ভবত সাপ। কারণ, পায়ের তালু বেয়ে যেটি প্যাঁচিয়ে ধরেছে, তার স্পর্শ পিচ্ছিল বেশ। এক সমুদ্র সাহস জড়ো করে নিচের দিকে তাকালাম।

না তাকানোই ভালো ছিল বোধহয়। যা ভেবেছি, তা। অসংখ্য সাপ। তিন-চার হাত লম্বা একেকটা; কুচকুচে কালো রং। মায়ের বকাঝকা তখন উধাও। বাইরে সুনশান। স্তব্ধ। ওয়াশরুমের কম্পন থামল। কম্পন শুরু হলো আমার। আমার দু'পায়ের চারপাশে

বৃত্তাকার ঘুরতে লাগল কুচকুচে কালো পিচ্ছিল গোটা দশ-বিশেক সাপ। পায়ের আঙুলের ফাঁকে মাথা ঢুকিয়ে টেনে টেনে বের করল শরীর ওরা। ঘঁষা খেল অনর্গল। গোড়ালি বেয়ে হাঁটুর ওপর উঠার চেষ্টা করল। একটা প্রবল টান অনুভব করলাম আমি। গ্রাভিটি। উপর থেকে। বুড়ো আঙুলের ওপর ভর করে দাঁড়ালাম। দরজায় হাত দিয়ে বাড়ি দিলাম কয়েকবার। ছাদের দিকে তাকালাম। আর তখনই ভয়টা পেলাম।

আমি একটু থামি। কেমন? একটানা গল্পটা বলতে পারি না। মাঝে মাঝে থামতে হয়। বিরক্ত হবেন না। আপনি যদি গল্পটা লিখেন কোনো একদিন, উত্তম পুরুষ-এ লিখবেন তবে। ওতে করে পাঠক ভয়টা পুরোপুরি না হলেও কিছুটা অনুভব করতে পারবে। আপনি যদি লিখেন, রাফায়েত সাহেব একদিন ওয়াশরুমে আটকা পড়লেন এবং ভয় পেলেন, ওতে খুব একটা কানেক্টেড হবে না কেউ। অন্য একজন ভয় পায়, অন্য একজন তা শুনে অন্য একজনকে শোনায়, মাঝখানে যে মাধ্যমগুলো ব্যবহার করা হয়, সেগুলো ভয় খেয়ে ফেলে। গল্প হবে সরাসরি। ধর তক্তা মার পেরেক। যা বলছিলাম, আমার পায়ের কাছে অসংখ্য পিচ্ছিল সাপ, পানি। চারপাশ অন্ধকার। বাইরে সুনশান। আমি বুড়ো আঙুলে ভর করে দাঁড়ালাম। দরজায় হাত দিয়ে বাড়ি দিলাম কয়েকবার। আর তখনই ভয়টা পেলাম।

দেখলাম ওয়াশরুমের ছাদ খোলা। খোলা ছাদের ওপাশে কিছু নেই। কিছু নেই মানে কি বুঝেছেন আপনি? কিছু নেই মানে শূন্য। আপনারা শূন্য বলতে যা বোঝেন, তাও না। আসমানের দিকে তাকিয়ে বলতে পারবেন না, শূন্য। অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্রে পূর্ণ ওটি। একটা খালি বাক্সের ভেতর কিছু নেই। আপনি বলতে পারেন, ঐ বাক্স শূন্য। আদতে তা ঠিক না। বাক্সের ভেতর হাওয়া আছে। হাওয়া বের করে দিন। তাও বাক্স শূন্য না। বাক্সের ভেতর আছে অন্ধকার। যদি দাবী করেন ভেতরে আলো আছে, তাও আপনি হারবেন। যদি দাবী করেন, ভেতরে আলো নেই, তাও আপনি হারবেন। আলোর অনুপস্থিতিই হলো অন্ধকার। আচ্ছা, মানলাম আপনি অন্ধকারও বের করে দিলেন। যদিও সম্ভব না। তাও মানলাম ভেতরে অন্ধকার নেই। তবে কী আছে ভেতরে?

উত্তর দিতে পারবেন না। বলতে পারবেন বাক্স শূন্য, কিন্তু প্রমাণ করতে পারবেন না। প্রমাণ করার জন্য আপনার বাক্সটা খুলে দেখতে হবে। আর যদি দেখেন, তাহলে শূন্য হারাবে। কেন?

প্রশ্নটা লুকিয়ে আছে আমরা কীভাবে দেখতে পাই, এই প্রশ্নের উত্তরের ভেতর। আমরা কীভাবে দেখি? বাক্সটা আমরা দেখতে পাই, কারণ বাক্স থেকে আলো এসে আমাদের কর্ণিয়ায় পড়ে। আমরা বলি চোখের মনি। রিফ্লেকটিভ সারফেজ। তারপর ঐ আলো ক্রমশ লেন্স, বিউট্রাস হিউমার, রেটিনা, অপটিক নার্ভ, অপটিক কায়েজমা এবং তারপর ভিজ্যুয়াল কর্টেক্সে এসে পৌঁছায়। মস্তিষ্কের অংশ যেটি। মস্তিষ্ক তারপর আলোটা প্রসেস করে বাক্সটা দেখায় আমাদের। এখন আপনি বলতে পারেন, বস্তু থেকে প্রতিফলিত কিংবা নির্গত আলোই যদি আমাদের দেখার একমাত্র প্রক্রিয়া হয়,

তবে অন্ধকার কীভাবে দেখি আমরা? অন্ধকারের তো কোনো আলোই নেই। এর উত্তর দেবে আপনার বিড়াল। কিংবা নিশাচর প্রাণীরা। ওরা রাতে দেখতে পায়। একই অন্ধকারে আমরা বাক্সটা দেখতে পাই না, ওরা দেখতে পায়, অর্থাৎ অন্ধকারেও অমন আলো বিদ্যমান, যেটা আমাদের দেখার ক্ষমতায় বা আওতায় নেই। অন্ধকারে দেখি না, অন্ধকার দেখি না–দু'টোর মধ্যে তফাৎ আছে। একটা স্কেল আছে দেখার। পৃথিবী বা পৃথিবীর বাইরের সকল আলো আমরা দেখতে পাই না। আমাদের দেখার আওতায় থাকা আলো আমরা দেখতে পাই শুধু। যেমনটা শব্দের ক্ষেত্রেও ঘটে। নির্দিষ্ট ডেসিবেলের আওয়াজ আমরা শুনি। বাকিটা শুনি না। অন্ধকার হলো ঐ দৃশ্যমান আলোর অনুপস্থিতি। চোখ বুজলে আপনি যে রং দেখতে পান, ওটা ছাই রঙা। অর্থাৎ, আপনি কোথাও শূন্য না। কিছু না কিছু এসে পূর্ণ করছে শূন্যস্থান।

আপনি কি বুঝতে পারছেন আমি আমার ভয়কে বর্ণনাতীত কেন বললাম? কারণ, আমি দেখেছিলাম শূন্য। না আলো, না অন্ধকার, না হাওয়া, না আসমান, না সসীম, না অসীম, না অপার্থিব কিছু। আমি দেখেছি শূন্য। শূন্য মানুষ দেখতে পায় না, কারণ শূন্যের অস্তিত্বই অমন। হার্ভার্ডের একজন অধ্যাপক বলেছিলেন, শূন্যের অস্তিত্ব বিরাজ করে আমাদের মনের মধ্যে। আমি আপনাকে খুব সহজ সরল উপায়ে আমার ভয়টা বুঝানোর চেষ্টা করব। তার আগে পরিষ্কার হওয়া জরুরি, শূন্য কী? অথবা সংখ্যা আবিষ্কার হলো কেন?

আপনার কাছে পাঁচটা মার্বেল আছে। আমাকে তিনটা দিলেন। আপনার কাছে থাকে বাকি দু'টো মার্বেল। আপনি বাকি দু'টোও দিলেন। এবং বললেন, আপনার কাছে আর মার্বেল নাই। কেন আপনি বললেন না, আপনার কাছে এখন শূন্য মার্বেল আছে? আপনার কাছে কোনো মার্বেল নাই, এবং আপনার কাছে শূন্য মার্বেল আছে- দু'টো বাক্যই তো সত্য। নাই এবং আছে। নাই এর আগে আছে, 'নাথিং'। আছে-এর আগে আছে 'শূন্য'। আপনি শূন্য বেছে নেননি কারণ আদিকাল থেকে মানুষ হিসেবে আমরা অন্য ভাগটা বেছে নিয়েছি। নাথিং। শূন্য নিইনি। কারণ, আমরা তা দেখতে পাইনি। আরও একটা কারণ আছে। নাথিং-এর আঠালো স্বভাব, যে কোনো কিছুর সাথে মিশে যেতে পারে। শূন্য পারে না। উদাহারণ দিই।

আপনি যখন বাকি দু'টো মার্বেল আমায় দিয়ে দিলেন, আপনি বলতে পারেন, আমার হাতে কোনো মার্বেল নেই। আবার এও বলতে পারেন, আমার হাতে কিছু নেই। বিপরীতে শূন্যভাগটা বেছে নিলে দু'টোর ক্ষেত্রেই আপনাকে বলতে হবে, আমার হাতে শূন্য মার্বেল আছে। সমস্যাটা হলো, 'আমার হাতে কিছু নেই' এই স্টেটমেন্ট'টা। এইখানে আপনি মার্বেলের জায়গায় বল, ব্যাট, হেলমেট, বই, খাতা যে কোনো কিছু ব্যবহার করতে পারেন। আপনার হাতে ঐসব কিছু নেই। শূন্য তা পারবে না। শূন্যের জন্য প্রতিটা বস্তু আলাদা। আপনাকে ঐ স্টেটমেন্টের বিপরীতে প্রতিবার শূন্যের জায়গা বদলাতে হবে প্রতিটা বস্তুর আগে। যেমন, বলতে হবে, আমার হাতে শূন্য বল আছে। আমার হাতে শূন্য ব্যাট আছে। আমার হাতে শূন্য হেলমেট আছে ইত্যাদি।

আপনি কি লক্ষ করেছেন? নাথিং এবং শূন্য একই হওয়া সত্ত্বেও দু'টো পক্ষ কতটা আলাদা। নিরপেক্ষ দৃষ্টি থেকে বিবেচনা করলে বরং নাথিং বেশি রহস্যময়। কিন্তু নাথিং আমরা দেখি। আমরা দেখতে পাই, আপনার হাত খালি। কিছু নেই। আমরা দেখতে পাই, বাক্সের ভেতর খালি। কিছু নেই। আমরা দেখতে পাই, ওয়াশরুম খালি। কিছু নেই। কখনই আমরা দেখতে পাই না, আপনার হাতে শূন্য বিদ্যমান, বাক্সের ভেতর শূন্য ঢুকে আছে। মানুষ দেখে না। কিন্তু আমি দেখেছিলাম। এক সন্ধ্যায়। গাঢ় অন্ধকার ছেয়ে ছিল একটা ওয়াশরুমের ভেতর। ওয়াশরুমের ছাদ ছিল খোলা। ওপাশ ছিল শূন্য। আমি তাকিয়ে ছিলাম। আমার সারা গা হালকা হয়ে এসেছিল। কোনো এক তীব্র মহাকর্ষীয় টানে আমি উপরে উঠছিলাম ধীরে। ভাসছিলাম। চোখ বোজার আগমুহূর্তে আমার ঠোঁট কেঁপে উঠেছিল একবার। যখন চোখ বুজলাম, দরজা খোলার আওয়াজ পেলাম।

হলুদ বাল্ব জ্বলে উঠল। আমি ধপাস করে নিচে পড়লাম। ওয়াশরুমের সমস্ত অন্ধকার ঘুলঘুলি দিয়ে পালালো হুড়োহুড়ি করে। মা দরজায় দাঁড়িয়ে তখন। আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন। আমার মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছিল অনর্গল। ওরকম নয় যে আমি হুঁশ হারিয়েছিলাম। দিব্যি হুঁশ ছিল। মা আমাকে কোলে করে নিয়ে ছুটে গেলেন হসপিটাল। সারা পথ কাঁদলেন ঝরঝর করে। চুমু চুমুতে আমার নরম গাল ভিজিয়ে দিলেন। ফোঁপালেন। ফিসফিস করলেন, "আর কোনোদিন এমন হবে না বাবা। আমার লক্ষ্মী বাবা। আমি খুব খারাপ মা। আর কোনোদিন অমন হবে না বাবা প্রমিস।"

আমি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম মায়ের দিকে। আমার শূন্য দৃষ্টি মাকে হতবিহ্বল করে তুলল ক্রমশ। ডাক্তার আশ্বাস দিলেন। আতঙ্কের কিছু নেই। এটা নর্মাল। ভয় পেলে অমন হয়। দুয়েকদিন রেস্ট করুক। ঠিক হয়ে যাবে। মা আমায় নিয়ে বাসায় ফিরলেন। ওয়াশরুম থেকে বের হওয়ার পর থেকে আমি একফোঁটা কাঁদিনি। কথা বলিনি একটা শব্দও। ডাক্তার যদিও জানিয়েছেন, শকড। নর্মাল ব্যাপার। সময় দিন। খুশি রাখুন ওকে। কথা বলুন। ভয় কেটে গেলে কথা বলবে। মা আমায় ঐ রাত্তিরে গল্প শুনালেন। রাজকুমারের গল্প। রাক্ষসপুরীর গল্প। জলপরীর গল্প। গভীর রাতে ঘুমন্ত মায়ের বুকে ঢুকে ফিসফিস করে আমি মাকে শুনালাম, শূন্য গল্প।

"কী হয়েছে বাবা? পি করবে?"

আমি জড়ানো স্বরে প্রথম কথা বললাম, "মা, আমাদের ওয়াশরুমের ছাদ খোলা।"

"কই না তো। ছাদ খোলা হবে কী করে বাবা? আমরা তো তিনতলায় থাকি। এটা ছয়তলা বিল্ডিং। আমাদের উপর তো আরো তিনটা ছাদ আছে বাবা।"

"তবে আমি যে দেখলাম।"

"কী দেখেছো তুমি?"

"আমি দেখলাম ছাদ নেই। ছাদের ওপাশে–"

"ছাদের ওপাশে কী বাবা?"

“ছাদের ওপাশে কিছু একটা মা। আমি জানি না। খুব খালি। ফাঁকা। আমি ওরকম কোনোদিন দেখিনি।”

মা আমায় শক্ত করে আঁকড়ে ধরে বললেন, “তুমি ভয় পেয়েছো বাবা, ওসব মনের ভুল। ছাদের ওপাশে কিচ্ছু নেই।”

আমি জানলাম, মা আর আমার মধ্যে একই জিনিস নিয়ে কথা হচ্ছে। পার্থক্য হলো, মা দেখেছেন নাথিং, আমি দেখেছি শূন্য। আমি কোনোদিন মাকে বুঝাতে পারিনি, ছাদের ওপাশের ঐ বর্ণনাতীত জিনিসটা দেখতে কেমন ছিল? দেখে কী মনে হয়েছিল আমার? কেমন ভয়ই বা অনুভব করেছিলাম আমি? শুধু মা নয়, কাউকে বোঝাতে পারিনি। মা আমায় দু’হাতে জড়িয়ে বুকের সাথে মিশিয়ে ফেললেন একদম। কাঁদো স্বরে বললেন, “আমি আর কক্ষণও তোমার উপর রাগবো না বাবা।”

মা ভয়ানক অপরাধ করেছিলেন। তখন বুঝতে পারিনি, এখন বুঝতে পারি আমি। পৃথিবীর কোনো উন্নত দেশে এমন কিছু মা করতে পারতেন না। মেন্টাল অ্যাসাইলামে ভর্তি হতে হতো তাকে তবে। অথবা দিনাতিপাত করতে হতো চৌদ্দ শিকের ভেতর। আমি মাকে ক্ষমা করে দিলাম ঐ রাতে। এবং মা কথা রেখেছিলেন। আমার উপর কখনই আর রাগ করেননি। সর্বোচ্চ কড়া স্বরে ধমক দিয়েছেন দু’টো। দিয়েই হয়তো বা আঁতকে উঠেছে তাঁর বুক। আমি ওয়াশরুমের শূন্য দেখার কথা ভুলে গেলাম ধীরে। পুরোপুরি ভুলতে হয়তো পারলাম না। পুরোপুরি ভোলা অসম্ভব। খুব আচমকা মাঝে মাঝে মনে পড়ত ঐ সন্ধ্যার কথা। ঐ অন্ধকার। গ্রাভিটি। ঠাণ্ডা জল। পিচ্ছিল সাপ। আর ছাদের ওপাশের আশ্চর্য শূন্য। তখন শরীর শিরশির করত। পায়ের আঙুল কাঁপতো। পা গুটিয়ে নিতাম আমি।

সময় বয়ে গেল তরতর করে। আচমকা চমকে চমকে উঠাও বন্ধ হলো আমার। পড়াশোনায় মনোযোগ দিলাম। বন্ধু-বান্ধব হলো। প্রেম হলো। কলেজ ক্যাম্পাসে আড্ডা দিলাম জমাট আমরা। সকালের ঝালমুড়ি, সিঙ্গাড়া, রাত্তিরের বারবিকিউ। আমার জীবন হলো চূড়ান্ত পূর্ণ। কোথাও কোনো কমতি নেই। এবং একদিন ঘটলো ঘটনা। আমার হয়ে গেল বিচ্ছেদ।

দুই হাজার বাইশে বসে বিচ্ছেদ নিয়ে ফোঁস ফোঁস করে কাঁদবো–অমন ছেলে আমি নই। দিব্যি মেতে রইলাম। খানিকটা মন খারাপ হলো। সিনেমা, মিউজিক, বন্ধু সর্বদা পাশে থাকল আমার। ঐ মন খারাপি কাটিয়ে উঠলাম দ্রুত। আমার প্রাক্তন প্রেমিকা একদিন আমায় ফোন করে বাসায় ডাকলো। খুব জরুরি নাকি দরকার। খুব বেশি দিনের সম্পর্ক ছিল না আমাদের। বাসায় যাওয়া হয়নি কখনও। প্রাক্তনের বাসায় পা রেখে আমি হকচকিয়ে গেলাম। ঐ বাসা। যে বাসা মা বদল করেছিলেন আমার অসুস্থ হওয়ার কয়েক মাস পর। কারণ, এই বাসার ওয়াশরুমে আমি আর যাইনি। মা আমায় নিয়ে যেতেন পাশের বাসায়। ওখানেই কাজ সেরে আসতাম। অন্য একজনের বাসায় রাত বিরাতে কতদিন পুত্রকে হাগুমুতু করাবেন মা?

বাসা বদল করেছিলেন তাই। আমি আর এই এলাকার আশেপাশেও ঘেঁষিনি বহু বৎসর। ঐ রাতে পরিচিত বাসার পরিচিত গেইটে পা দিয়ে শরীরে পরিচিত শিরশির টের পেলাম আমি। আমার উচিত ছিল, তখনই গেইট থেকে ডানদিক ফিরে দৌড় দেওয়া। গলি পার হওয়ার আগে দৌড় না থামানো। অথচ কোনো এক অদৃশ্য শক্তির টানে আমি ধীর পায়ে এগিয়ে গেলাম সামনে। সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় উঠলাম। দরজায় নক করলাম। পা কাঁপলো থরথর করে। আমার প্রাক্তন দরজা খুলল। চোখ জোড়া ছলছল তার। দরজা খুলতেই আমায় জাপটে ধরল। আর ফিসফিস করে বলল, "আমি থাকতে পারছি না, আমায় ক্ষমা কোরো।"

আমি ঢোক গিললাম। আমিও থাকতে পারছি না এই বাসায়। ঐ যে দেখা যাচ্ছে, ওয়াশরুম। দরজাটার রং পাল্টেছে। ছোটবেলায় এই দরজার রং ছিল কমলা। সুইচবোর্ড ছিল ডানে। বেশ পাল্টেছে অবস্থা। এখন দরজার রং রুপালি। রুপালি দরজাটা লাগানো, খিল সাঁটা। আমি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। প্রাক্তন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। আমি প্রাক্তনকে আলতো হাতে সরিয়ে ওয়াশরুমের দিকে এগিয়ে গেলাম। দরজা খুললাম।

আরেকটু থামি। কেমন? একটু সময় নিই। চা'টা খেয়ে নিন। ঠাণ্ডা হয়ে এলো। আমার গলার স্বরও ঠাণ্ডা হয়ে আসে, গল্পের এই জায়গায়। পুরো গল্প এক স্বরে বললেও একটু পর আপনি টের পাবেন, স্বরটা ভেজা আমার। কারণ আছে বৈকি। প্রাক্তনকে আমি ভালোবাসি। বিচ্ছেদের পরও। যুবক যুবতী অমন করে। বিচ্ছেদের পর যুবতী বেশি কান্না করে, রাত্তির কাটে না একদম তার। আর যুবক প্রথম প্রথম টেরও পায় না কিচ্ছুটি। পরে যুবতী শক্ত পাথর নিথর হয়, যুবক ধীরে ভেঙে পড়ে। আমি যে সময়টার গল্প বলছি, তখন আমার 'কারোর অভাববোধ অনুভব করতে না পারা' পর্ব চলমান। আর প্রাক্তন পার হচ্ছিল 'কান্নাকাটি' পর্ব। এখন আমি আমার পর্বটা পার হয়ে ভেঙে চুরচুর। তাই আমার গলার স্বর ভেজা। আমার প্রাক্তনের নাম–আচ্ছা থাক। নাম বলার দরকার নেই। আপনি বরং এই ফাঁকে চা খেতে খেতে এলিসা লামের ছোট্ট এই গল্পটি শুনুন। আমার গল্পের সাথে এলিসা অল্প একটু যুক্ত। ওটুকু প্রমাণ করবে সত্যতা।

লস এঞ্জেলসের একটা হোটেলে এলিসা মারা গিয়েছিল দুই হাজার তেরো সালে। জানুয়ারির একত্রিশ তারিখ উধাও হয়েছিল। ফেব্রুয়ারির এক তারিখ পরিবার তার নামে মিসিং রিপোর্ট করে। এলিসার লাশ পাওয়া গিয়েছিল ফেব্রুয়ারির উনিশ তারিখ। হোটেলেরই একটা পানির ট্যাংকের ভেতর। যে ট্যাংক থেকে হোটেলে খাওয়ার পানি সাপ্লাই দেওয়া হয়, রান্নার কাজ সারা হয়। আচমকা হোটেলে আগত গেস্ট"রা টের পেলেন, পানির রং হালকা কালো। এবং স্বাদও অন্যরকম। ট্যাংক পরীক্ষা করতে যেয়ে এলিশার পঁচা-গলা লাশ পাওয়া গেল। হোটেলের সিসিটিভি ফুটেজ থেকে পাওয়া গেল একটা উইয়ার্ড ভিডিয়ো। যেখানে সর্বশেষ জীবিত দেখা গিয়েছিল এলিসাকে। ভিডিয়োটা একটা লিফটের ভেতর। আড়াই মিনিটের ভিডিয়ো শুরু হয়, এলিসা লিফটে

ঢুকে, বাটন প্রেস করে, লিফট বন্ধ হয় না। এলিসা বাইরে পরীক্ষা করে দেখে কেউ আছে কিনা। ফের ঢুকে। লিফট বন্ধ হয় না। এলিসা লিফট থেকে বাইরে বের হয়। ভিডিওর এই অংশটা লোমহর্ষক। এলিসা লিফটের দরজায় দুই হাত সামনে এনে কিছু একটা অঙ্গভঙ্গি করে, যেন কাউকে কিছু বুঝাচ্ছে সে, যেন সামনে কিছুর অস্তিত্ব আছে। অথচ সামনে কেউ নেই, কিছু নেই। পরে জানা গেল, এলিসার বাইপোলার ডিজঅর্ডার ছিল। কেন সে নিজের ফোন উধাও করে এক রাত্তিরে বিল্ডিং রেখে অমন উঁচু পানির ট্যাংকে ঝাঁপ দিয়েছিল; কীভাবে ভেতর থেকে বন্ধ করেছিল দরজা আর কেনই বা মরে গিয়েছিল—অনুমান করেছে অনেকে অনেকরকম। প্রমাণ হয়নি কিছুই। প্রমাণ করা যাবে না কিছু। আমি জানি। শূন্য প্রমাণ করা যায় না। শূন্য অনুভবের বিষয়।

প্রাক্তনের গল্পে ফিরি। প্রাক্তন আমার পিছু পিছু হাঁটলো। আমি হাঁটলাম ওয়াশরুমের দিকে। রুপালি দরজা খুললাম। ভেতরে তাকালাম। পা থরথর করে কাঁপলো। ঢোক গিললাম অনর্গল। ঘাম দিলো সমস্ত শরীর। প্রাক্তন হতবাক। জিজ্ঞেস করল, "তুমি ঠিক আছো রাফায়েত?"

"তুমি কবে থেকে এই বাসায় আছো?"

"প্রায় দুই বৎসর। কেন?"

"ওয়াশরুমে যাও?"

প্রাক্তন অপ্রস্তুত হাসি হাসলো।

"এ কেমন কথা?"

"ভয় পাও?"

"কাকে ভয় পাবো?"

"ওয়াশরুমে ঢুকে কোনোদিন উপরের দিকে তাকিয়েছো?"

প্রাক্তন আমার হাত ধরল। টেনে এনে আমায় সোফায় বসালো। আমার সারা গা ভিজে গেল ঘামে। প্রাক্তন আমার কপাল মুছে দিলো ওড়না দিয়ে। চুমু খেল নাকের মাথায়। কপালে হাত দিয়ে পরীক্ষা করল জ্বর কিনা। পাশে বসে আমার হাতখানা দু'হাতে মুঠো করে ধরে বলল, "আমি আর কোনোদিন তোমায় ছেড়ে যাব না।"

দেখুন কাণ্ড। প্রাক্তন ভাবল আমি উল্টাপাল্টা বলছি, কারণ আমার মন খারাপ। প্রচণ্ড মন খারাপ। আমাদের বিচ্ছেদ হয়েছে। আমি প্রাক্তনকে ভেবে ভেবে মাথা খারাপ করে ফেলেছি। সত্য হলো, প্রাক্তন আমার মাথায়ই নেই। আমার মাথায় আছে একটা ওয়াশরুম। যার ছাদ খোলা। ছাদের ওপাশে শূন্য। খুলে বললাম। প্রাক্তন আসমান থেকে পড়ল।

"মানে কী রাফায়েত?"

"আমি সত্য বলছি।"

"পাগল। ছোটবেলায় মানুষ কত কী দেখে ভয় পায়। সেইসব বুঝি সত্য? আমি তো গাছতলা দিয়ে হাঁটতেই পারতাম না। গাছের উপর থেকে লম্বা চুল ফেলে কে যেন তুলে নিয়ে যাবে এই ভয়ে। ওসব বুঝি সত্য?"

প্রাক্তন আমার মাথায় হাত বুলালো। আমায় গভীর আদরে বুঝালো, ওসব সত্য নয়। এক সন্ধ্যায় না বুঝে মা আমায় ভয়ানক শাস্তি দিয়েছিলেন। অন্ধকারভীতি ছিল আমার। আমি হ্যালুসিনেট করেছি ওসব। প্রচণ্ড ভয়ের সময় মানুষ ভুলভাল দেখে। এক ছটাক সত্যতা নেই তার। আমি ভয়ে ভয়ে তাকালাম ওয়াশরুমের দিকে আবার। প্রাক্তন মৃদু হেসে আমায় টেনে আনলো ওয়াশরুমের সামনে। দরজা খুলল নিজ হাতে। দেখালো, "এই যে, উপরে দেখো, ছাদ। আছে কিছু?"

আমি তাকালাম। সাদা ছাদ। প্রলেপ লাগানো। চুনকাম করা আয়তাকার একখানা ঘর। একটা ট্যাপ। সবুজ রঙের বদনা। একটা কমোড। উপরে ঘুলঘুলি। প্রাক্তন ওয়াশরুমের ভেতর ঢুকল। আমায় দেখালো, উপরে আঙুল দিয়ে। "দেখো। কিচ্ছুটি নেই।" আমি দরজা লাগালাম শব্দ করে। ভেতর থেকে প্রাক্তন বলল, "রাফায়েত, এটা কেমন ফাজলামো? দরজা খুলো।"

আমি দরজা খুললাম না। প্রাক্তন দরজায় বাড়ি দিলো।

"দরজা খুলো রাফায়েত। এইসব মজা কিন্তু আমার ভালো লাগে না।"

আমি সুইচবোর্ডে আঙুল রাখলাম। লাইট অফ করলাম। প্রাক্তন চিৎকার করল। কড়া স্বরে ধমক যাকে বলে। আমি পিছু হটলাম। প্রাক্তন জোরে জোরে দরজায় বাড়ি দিলো। লাথি দিলো। আমি ঘর ছেড়ে বের হলাম। গেইট পার হলাম। এবং ডানদিক ফিরে দৌড়ালাম। এক দৌড়ে বাসায়। পরদিন আমার প্রাক্তনের লাশ পাওয়া গেল নিউমার্কেট পার্শ্ববর্তী বিল্ডিং-এর ছাদে একটা পানির ট্যাংকের ভেতর।

আমি জানি আপনি কী কী ভাবছেন? পুরুষ ও নারীর মধ্যে একটা মনস্তাত্ত্বিক বিষয় আছে। নারী সাধারণত পুরুষের শারীরিক প্রতারণা নিতে পারলেও মানসিক প্রতারণা নিতে পারে না। উল্টোটা হলো পুরুষ। পুরুষ নারীর মানসিক প্রতারণা নিতে পারে, শারীরিক প্রতারণা একদম নয়। শারীরিক ও মানসিক প্রতারণা বুঝেছেন নাকি আরও স্পষ্ট করে বুঝাবো? শারীরিক প্রতারণা হলো, একজনের প্রতি কমিটেড থেকেও কোনো বিপরীত লিঙ্গের সাথে শোয়া, সঙ্গম করা। আর মানসিক প্রতারণা হলো, একজনের প্রতি কমিটেড থেকেও বিপরীত লিঙ্গের কাউকে ভালোবাসা। এরূপ ক্ষেত্রে নারীর চেয়ে পুরুষ ভায়োলেন্ট বেশি। এইজন্যই দেখবেন, পুরুষ যতটা না দুঃখ পাচ্ছে তাকে ছেড়ে যাচ্ছে নারী, তারচেয়েও বেশি দুঃখ পাচ্ছে, ঐ নারী এখন অন্য কাউকে চুমু খাবে, অন্য কারোর সাথে করবে সঙ্গম–এইসব ভেবে। আমি কি বোঝাতে পারলাম?

ঠিক এই মুহূর্তে মাথায় এইসব ঘুরঘুর করছে আপনার। আরও ঘুরঘুর করছে, আমি ওরকমই টিপিক্যাল একজন বাঙালি পুরুষ। যে পুরুষ বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারেনি। বিচ্ছেদের পর হয়তো বা কোনো একটা প্রমাণ পেয়েছে, নারী প্রতারণা করেছে তার সাথে কিংবা নারী খুব সম্ভবত প্রেমে পড়তে যাচ্ছে অন্য কারোর। ব্যাস। খুন করে ফেললাম। এবং বসে বসে আপনাকে ঐ খুনের গল্প শোনাচ্ছি।

উহু! অমন ভাববেন না। ওরকম হয় না।

আপনাকে এখনও মূল তথ্য দেওয়া হয়নি। আমার প্রাক্তন সপরিবারে বাস করছে নিউমার্কেটের ঐ পাশের বিল্ডিং-এরই চতুর্থ তলায়। যে বিল্ডিং-এর ছাদে লাশ পাওয়া গিয়েছিল তার। ওরা বাস করছে ওখানে গত দুই বৎসর ধরে। ঐ বাসায় কক্ষণও নয়, যেখানে আমি গতকাল গিয়েছিলাম আর ওয়াশরুমে তাকে আটকে এসেছিলাম। আরও একটা তথ্য দিই। আমার প্রাক্তনের মোবাইল উধাও হয়নি এলিসার মতো। মোবাইলের কল লিস্ট পরীক্ষা করা হলে আমি ধরা পড়তাম। কারণ সর্বশেষ আমায় ফোন করেছিল সে ঐ রাতে। কিন্তু ধরা পড়িনি। কারণ, প্রাক্তনের ফোন নাম্বারের গত এক সপ্তাহের কল লিস্টেও আমি ছিলাম না। সবচেয়ে আশ্চর্য হলো, জগতের স্বাভাবিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাক্তনের সাথে গতকাল আমার দেখাই হয়নি। প্রাক্তন গতকালও রাত আট'টা অবধি ছিল পরিবারের সাথে। খেয়ে গল্প করে সিনেমা দেখে মধ্যরাতে ঘুমাতে গিয়েছিল। পরদিন পাওয়া গেল লাশ।

লিফট থেকে ছাদের ট্যাংক কিংবা ওয়াশরুম থেকে ছাদের ট্যাংক। মৃত্যুগুলো ওরকম কেন হলো? কিংবা একই সময় একটা আস্ত মানুষ দু'টো ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় অবস্থান করেছিল কীভাবে? তারা প্রকৃতপক্ষে কী দেখেছিল ওয়াশরুমে? আমি যা দেখেছি, তা? তবে আমার লাশ পাওয়া গেল না কেন কোথাও? ওদের লাশ কেন পাওয়া গেল? আর কীভাবেই বা তাদের শরীর পৌঁছালো ঐ জায়গায়? প্রশ্ন আছে। উত্তর নেই। কিন্তু আমার কাছে উত্তর আছে। সমস্যা একটাই। ঐ উত্তর কাউকে জানানোর উপায় জানা নেই আমার। আমি জানি শূন্য কী। কিন্তু আমি কাউকে বুঝাতে পারি না। আমি জানি, আমার বাসার ঐ ওয়াশরুমের ছাদের ওপাশ দেখতে কেমন? কিন্তু আমি কাউকে দেখাতে পারি না। যাকেই দেখানোর চেষ্টা করেছি, তার লাশ পাওয়া গিয়েছে কোনো এক বাসার ছাদের ট্যাংকে। প্রথম প্রথম অস্বস্তি লেগেছে খুব। গত ছয় বৎসরে আমি শূন্য দেখানোর চেষ্টা করেছি সতেরোজনকে। ষোলোজনের লাশ পাওয়া গিয়েছে বিভিন্ন বাসার বিভিন্ন ছাদের ট্যাংকে। একজনের লাশ পাওয়া যায়নি। বলুন তো তিনি কে?

অনুমান করুন। উহু! হয়নি। তিনি আমার মা।

আমার মায়ের লাশ পাওয়া যায়নি। তিনি দিব্যি সুস্থ আছেন। কিন্তু একটা সমস্যা হয়ে গেছে বুঝলেন। মাকে প্রচণ্ড ভালোবাসি আমি। মাকে আমি শূন্য দেখাইনি। মাকে শূন্য দেখানোর কোনো ইচ্ছে আমার ছিল না। আমি মাকে সমপর্ণ করেছি বলা যায়। খুলে বলি। আমার প্রথম হত্যা। প্রাক্তন। প্রাক্তন মরে যাওয়ার পর ভয়ানক এক অপরাধবোধ আমায় ঘিরে ধরল। ঐ রাত্তিরে প্রাক্তনকে আমি আটকেছিলাম ওয়াশরুমে মরে যাওয়ার জন্য নয়। বরং সে যাতে শূন্য দেখতে পায়। এক রাত ওয়াশরুমে আটকে থাকলে কোনো মানুষ মরে যাবে না। তাছাড়া তার বাবা মা বাসায় ফেরত আসবে কিছুক্ষণ পর। তারাই উদ্ধার করবে তাকে। কিন্তু ওসব হয়নি। যদিও যুক্তি তর্ক অন্য কথা বলে। যুক্তি তর্ক বলে, প্রাক্তনের মৃত্যুর সাথে আমার কোনো হাত নেই। কিন্তু আমি জানি, আমার হাত আছে। আশপাশ সহজে বোকা বানানো যায়, নিজেকে বোকা বানানো সহজ না। আমি জানি, প্রাক্তন হত্যার পেছনে শুধুমাত্র আমার খামখেয়ালীপনাই দায়ী। যদি না আটকাতাম

রুপালি দরজা, ওসব কিচ্ছুটি হতো না। আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল ভেবে ভেবে এইসব। মাকে বললাম, "আমি খুন করিনি।"

মা অবাক হলেন।

"কাকে খুন করোনি? কী বলছো তুমি?"

"আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাচ্ছি মা।"

মা আমার দু'গালে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে বাবা?"

আমি মাকে বলতে পারলাম না, আমি এক যুবতীকে মেরে ফেলেছি ওয়াশরুমে দরজা আটকে। গভীর রাত্তিরে আমার মনে হলো, কেন আমি দায়ী করছি নিজেকে? পৃথিবীর কোনো যুক্তি এই ঘটনার পক্ষে যাবে না। প্রাক্তন কখনই ঐ বাসায় যায়নি। বিচ্ছেদের পর প্রাক্তনের সাথে আমার দেখা হয়নি গত এক সপ্তাহ। গত রাত্তিরের ঘটনা শুধুই একটা ভ্রম। ঘটনাটা যে শুধুই একটা ভ্রম, তা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে, নিজেকে হালকা করার উদ্দেশ্যে কিংবা বলা যায় শুধুমাত্র পরীক্ষা করে দেখার জন্য আমি পরদিন ঐ বাসায় আবার গেলাম। বাসায় তালা দেওয়া। বাড়িওয়ালার সাথে কথা বললাম। কথাবার্তা চূড়ান্ত করে বাসাটা ভাড়া নিলাম। শহরের স্বাভাবিক নিয়ম-কানুন অনুসারে কোনো ব্যাচেলর অমন বাসা ভাড়া পাওয়ার কথা নয়। আমি পেলাম। কারণ, বহু বৎসর ধরে পুরো ঐ বিল্ডিংটা পড়ে আছে খালি। ওদিক মানুষ বাসা ভাড়া নেয় না আজকাল। আমি নিলাম। আমার কাজে নিলাম। বাসায় ঢুকলাম। অবিকল একই বাসা। সেই রাত্তিরে প্রাক্তন থাকাকালীন যেমন দেখেছিলাম, একই রঙা দরজা, রুপালি। পা টিপে টিপে ওয়াশরুমের দরজায় দাঁড়ালাম। কাঁপা কাঁপা হাতে খুললাম ওটা। সুইচ অন করলাম। তারপর অফ করলাম। মাথা বাড়িয়ে উপরের দিকে তাকালাম। পরিচিত শিহরণ টের পেলাম গায়ে। ছাদের ওপাশ শূন্য। সে এক অবর্ণনীয় দৃশ্য। আমি বর্ণনা করতে পারি না। আমার সারা গা থরথর করে কাঁপতে লাগল। টান অনুভব করলাম আমি। কমোড থেকে গলগল করে পানি উঠার আওয়াজ পেলাম। হুঁশ ফিরে এলো। সপাৎ শব্দে দরজা বন্ধ করলাম। বাসা থেকে বের হলাম দৌড়ে। ও আমার ভয়। আমি জানি। এই ভয় শুধুই আমার। অন্য কেউ কেন পাবে? প্রাক্তনের মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী নয় কস্মিনকালেও। দাবীর স্বপক্ষে আমার একটা পরীক্ষা করা দরকার।

একজন টোকাই জোগাড় করলাম। পরদিন 'খাবার দেবো' বলে বাসায় আনলাম তাকে। ওয়াশরুমে আটকে দরজায় তালা দিয়ে নিজের বাসায় ফেরত আসলাম। পরদিন বাসায় যেয়ে তালা খুলে ওয়াশরুমের সামনে পৌঁছে প্রথমবার টের পেলাম, একটা খালি বাক্সের ভেতর শূন্য আছে কি নেই প্রমাণ করা কেন এত জটিল কর্ম? আমার সামনে যে রুপালি দরজা, আমি জানি ঐ দরজা খুললে প্রমাণ পাবো। হয়তো বা মুক্তি পাবো তুমুল অপরাধবোধ থেকে নয়তো ডুবে যাব অতলে আবার। ভেসে যাব শূন্যে। ওয়াশরুমের দরজা খুললাম। ওয়াশরুমে টোকাই নেই। আমার বুকটা হু হু করে উঠল। টোকাইয়ের লাশ পাওয়া গেল দুপুরের দিকে। কোনো একটা বাসার ছাদে। আমার মাথায় জিদ চাপলো। অন্ততপক্ষে একটা প্রমাণ আমায় নির্দোষ দাবী করুক। এ অসম্ভব।